নভেম্বর ২০১৭
৬ষ্ঠ পর্ব, ৪র্থ সংখ্যা

ইনফো স্বাস্থ্য সামায়িকী

গর্ভকালীন খিঁচুনি বা এক্লাম্পশিয়া

ম্যালেরিয়া - একটি মশাবাহী পরজীবীজনিত রোগ

ACI ADVANCING POSSIBILITIES

সূচী

রোগের ইতিকথা ২

চিকিৎসা ৩

ছবি দেখে রোগ নির্ণয় ৭

বিশেষ প্রবন্ধ ৮

জনস্বাস্থ্য ১২

স্বাস্থ্যকথা ১৪

ইনফো কুইজ ১৫

চমকপ্রদ তথ্য ১৬

সম্পাদক মন্ডলী

এম. মহিবুজ জামান
ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান
ডাঃ তারেক-আল-হোসাইন
ডাঃ আদনান রহমান
ডাঃ ফজলে রাব্বি চৌধুরী
ডাঃ মোঃ ইসলামুল হক
ডাঃ ফাহিমা জাহান ইশানা
ডাঃ রাশনা শারমিন যুথী
ডাঃ ফায়েজা বিনতে ইসলাম

ডিজাইন

ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশন লিঃ
রোড-১২৩, বাড়ী-১৮এ
গুলশান-১, ঢাকা-১২১২

রোগের ইতিকথা

কালাজ্বর

স্যার উইলিয়াম লিশম্যান ও স্যার চার্লস ডোনোভান চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে কালাজ্বরের জীবাণু আবিষ্কারের জন্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। স্যার উইলিয়াম লিশম্যান ছিলেন একজন স্কটিশ চিকিৎসক এবং স্যার চার্লস ডোনোভান ছিলেন একজন আইরিস চিকিৎসক। ১৮২৪ সালে ইন্ডিয়াতে প্রথম কালাজ্বরের আবির্ভাব হয়। এই জ্বরে পরপর তিন বছরে প্রায় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ১৯০১ সালে কলকাতার দমদম নামক এলাকায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে একজন সৈনিক জ্বরে আক্রান্ত হন। তার জ্বরের সাথে রক্তশূন্যতা হয় এবং প্লীহা (Spleen) বড় হয়ে যায়। স্যার উইলিয়াম লিশম্যান ঐ সৈনিকটির প্লীহা পরীক্ষা করে একটি ডিম্বাকৃতি পরজীবীর সন্ধান পান। এরপর তার পরীক্ষার ফলাফল ১৯০৩ সালে মাদ্রাজে প্রকাশিত হয় এবং তিনি জ্বরটির নাম দেন "দমদম জ্বর"। স্যার উইলিয়াম লিশম্যানের কয়েক সপ্তাহ পর স্যার চার্লস ডোনোভান এই জ্বরে আক্রান্ত অন্য রোগীদের প্লীহায় একই পরজীবীর সন্ধান পান ও মাদ্রাজে তার পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে তাদের নাম অনুসারে এই পরজীবীকে "লিশম্যানিয়া ডোনোভানি *(Leishmania donovani)*" নামে নামকরণ করা হয়। এই পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত জ্বরকে পরবর্তীতে "কালাজ্বর" নামকরণ করা হয়।

স্যার উইলিয়াম লিশম্যান
(১৮৬৫-১৯২৬)

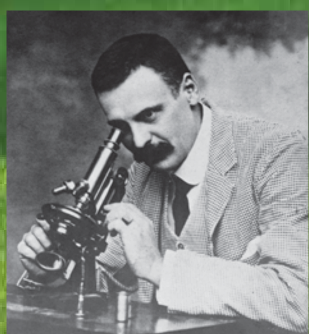

স্যার চার্লস ডোনোভান
(১৮৬৩-১৯৫১)

গর্ভকালীন খিঁচুনি বা এক্লাম্পশিয়া

গর্ভকালীন খিঁচুনি বা এক্লাম্পশিয়া মূলত প্রি-এক্লাম্পশিয়ার পরবর্তী অবস্থা যা সাধারণত গর্ভধারণের ৬ মাস পর অথবা প্রসবের সময় হতে পারে। গর্ভাবস্থার ২০ সপ্তাহ পর যদি কোনো নারীর রক্তচাপ ১৪০/৯০ মিলিমিটার অফ মারকারী বা তার বেশি হয় এবং প্রস্রাবের সঙ্গে প্রোটিন নির্গত হয়, তখন তাকে প্রি-এক্লাম্পশিয়া বলে। প্রি-এক্লাম্পশিয়ার সাথে রোগীর খিঁচুনি দেখা দিলে, তাকে এক্লাম্পশিয়া বলে। বাংলাদেশে গর্ভকালীন মৃত্যুর পাঁচটি প্রধান কারণের মধ্যে গর্ভকালীন খিঁচুনি বা এক্লাম্পশিয়া অন্যতম। এর কারণে বাংলাদেশে মোট গর্ভাবস্থায় ১১% প্রসূতি মায়ের মৃত্যু ঘটে। গর্ভকালীন খিঁচুনি নবজাতকের মৃত্যুর সম্ভাবনা পাঁচ গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। তবে সময়মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা গেলে মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা সম্ভব।

কারণ

গর্ভাবস্থায় খিঁচুনির কারণ সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে রক্তনালী স্বাভাবিকের চেয়ে সংকীর্ণ হয়ে যাওয়াকে গবেষকরা গর্ভাবস্থায় খিঁচুনির অন্যতম প্রধান কারণ বলে বিবেচনা করেন। রক্তনালীর সংকীর্ণতার কারণে গর্ভফুলের (Placenta) স্বাভাবিক কার্যকারিতা ব্যহত হয়, যার ফলে গর্ভকালীন খিঁচুনি হতে পারে। রক্তনালীর স্বাভাবিকের চেয়ে সংকীর্ণ হওয়ার কারণগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো-

- গর্ভকালীন সময়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে অথবা,
- বংশগত কারণে

এছাড়াও গর্ভকালীন সময়ে নিচের কারণগুলোর জন্য খিঁচুনি হতে পারে-

- প্রথমবার গর্ভধারণ করলে
- গর্ভবতী মায়ের বয়স ২০ বছরের কম অথবা ৩৫ বছরের বেশী হলে

- পরিবারের কারো গর্ভকালীন খিঁচুনির ইতিহাস থাকলে
- গর্ভবতী মায়ের ওজন বেশী হলে
- গর্ভবতী মায়ের উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস বা কিডনিজনিত রোগের ইতিহাস থাকলে
- গর্ভফুল স্বাভাবিক অবস্থানে না থাকলে
- দুইবার গর্ভধারণের মধ্যে ১০ বছর বা তার বেশী ব্যবধান হলে

লক্ষণ

এক্লাম্পশিয়ার প্রধান লক্ষণ হল গর্ভকালীন সময়ে খিঁচুনি হওয়া। খিঁচুনি গর্ভকালীন সময়ের ২০ সপ্তাহ থেকে প্রসবকালীন সময়ের মধ্যে যেকোনো সময় হতে পারে। খিঁচুনি ছাড়া আরো কিছু লক্ষণ দেখা দিতে পারে যা হলো-

- রক্তচাপ ১৪০/৯০ মিলিমিটার অফ মারকারী অথবা এর বেশি হতে পারে
- প্রচন্ড মাথা ব্যথা হতে পারে
- দৃষ্টি অস্পষ্ট হতে পারে
- পেটের ডানদিকে পাঁজরের নীচে ব্যথা হতে পারে
- বমি হতে পারে
- প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যেতে পারে
- হাত, পা, গোড়ালি এবং মুখে পানি জমতে পারে
- ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে

চিকিৎসা

পরীক্ষা

গর্ভাবস্থায় খিঁচুনি হলে নিচের পরীক্ষাসমূহ করতে বলতে হবেঃ

- **প্রস্রাব পরীক্ষা** (Urine Test) - প্রস্রাবের প্রোটিন পরীক্ষা করতে হবে
- **রক্ত পরীক্ষা** (Complete Blood Count) - অণুচক্রিকার পরিমাণ নির্ণয় (Platelet Count) করতে হবে
- **লিভার ফাংশন পরীক্ষা** (Liver Function Test)
- **কিডনি ফাংশন পরীক্ষা** (Kidney Function Test)
- **আল্ট্রাসনোগ্রাফী** (Ultrasonography of Pregnancy Profile) - গর্ভের বাচ্চার অবস্থা দেখতে হবে

চিকিৎসা

গর্ভকালীন সময়ে খিঁচুনি হলে গর্ভবতী মায়ের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে হাসপাতালে নিতে হবে। তবে হাসপাতালে নেওয়ার আগে কিছু প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া যেতে পারে। যেমন-

- পর্যাপ্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা নিতে হবে
- রোগী শ্বাসপ্রশ্বাস ঠিক ভাবে নিতে পারছে কিনা সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে
- রোগীকে বাম পাশে কাত করে শোয়াতে হবে

হাসপাতালে চিকিৎসা

রোগীকে হাসপাতালে নেওয়ার পর নিচের চিকিৎসা দেওয়া হয়ে থাকে-

- রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিক রাখতে অক্সিজেন দেওয়া হয়
- রক্ত সঞ্চালন ঠিক রাখার জন্য শিরা পথে স্যালাইন (৫% ডেক্সট্রোজ নরমাল স্যালাইন) শুরু করা হয়
- প্রতিদিন প্রস্রাবের পরিমাণ পরিমাপ করার জন্য মূত্রনালীতে নল (Catheterization) দেওয়া হয়
- হৃদপিন্ডে রক্ত সঞ্চালন ঠিক রাখার জন্য রোগীকে বাম কাত করে শোয়ানো হয়
- একটি অন্ধকার ও নীরব ঘরে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রোগীকে রাখা হয়
- রোগীর খিঁচুনি বন্ধ করতে এবং পরবর্তীতে যাতে খিঁচুনি না হয় সেজন্য ম্যাগনেসিয়াম সালফেট দেওয়া হয়
- সাধারণত গর্ভাবস্থায় রক্তচাপ কমানোর কোনো ওষুধ ব্যবহার করা হয় না, কিন্তু গর্ভকালীন খিঁচুনির সময় রক্তচাপ বৃদ্ধির কারণে নিফিডিপিন (Nifedipine), হাইড্রালাজিন (Hydralazine), আলফা মিথাইল ডোপা (Alpha Methyl Dopa) ব্যবহার করা হয়

উপরোক্ত চিকিৎসার পর যদি খিঁচুনি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে তাহলে নিচের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়-

- গর্ভকালীন সময় যদি ৩৮ সপ্তাহ হয় তাহলে সিজারিয়ান অথবা স্বাভাবিক প্রসব করা হয়
- গর্ভকালীন সময় যদি ৩৮ সপ্তাহ না হয় তাহলে কর্টিকোস্টেরয়েড দেওয়া হয়, তারপর প্রসব করানো হয়
- যদি গর্ভের বাচ্চার মৃত্যু হয় তখন স্বাভাবিক প্রসব করানোর চেষ্টা করা হয়। সম্ভব না হলে সিজারিয়ান প্রসব করানো হয়

যদি খিঁচুনি নিয়ন্ত্রণে না আসে তাহলে দ্রুত রোগীকে সিজারিয়ান অথবা স্বাভাবিক প্রসব করানো হয়।

জটিলতা

নিচে এক্লাম্পশিয়ার জটিলতা সমূহ দেওয়া হলো-

- মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ (Cerebral Haemorrhage)
- ফুসফুসে পানি জমা (Pulmonary Edema)
- কিডনি ফেইলিওর (Kidney Failure)
- লিভার ফেইলিওর (Liver Failure)
- ডিসেমিনেটেড ইন্ট্রাভাসকুলার কোয়াগুলেশন (Disseminated Intravascular Coagulation)

প্রতিরোধ

এক্লাম্পশিয়ার জন্য নিম্নোক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে-

- গর্ভকালীন সময়ে গর্ভবতী মাকে নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা করাতে হবে
- গর্ভকালীন খিচুনী প্রতিরোধে গর্ভাবস্থায় ১৬ সপ্তাহ থেকে ক্যালসিয়াম খেতে হবে
- রক্তচাপ ঠিক আছে কিনা, তা সব সময় পরীক্ষা করাতে হবে
- মায়ের ওজন স্বাভাবিক হারে বাড়ছে কিনা সেটা খেয়াল রাখতে হবে
- মায়ের মাথা ব্যথা, বমি ভাব বা শরীর ফুলে যাচ্ছে কিনা, তা খেয়াল রাখতে হবে
- গর্ভাবস্থায় মায়ের গর্ভকালীন পুষ্টি, বিশ্রাম ও মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করাতে হবে

তথ্যসূত্র: ১. *DC Dutta's Textbook of Obstetrics: 8th edition*
২. *ইন্টারনেট*

পেট ব্যথা

পেট ব্যথা দৈনন্দিন জীবনের একটি সাধারণ ঘটনা। এর কারণে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যঘাত ঘটে। যেকোনো বয়সে যেকোনো মানুষের পেট ব্যথার সমস্যা দেখা দিতে পারে। পেট ব্যথা সাধারণত কোনো রোগ নয়, এটি রোগের লক্ষণ। কিছুক্ষেত্রে পেট ব্যথা এমনিই ভালো হয়ে যায়, আবার কিছুক্ষেত্রে ব্যথানাশক ওষুধ খেলে ভালো হয়ে যায়। কিছু কিছু ব্যথা অনেক বড় রোগের লক্ষণ হিসেবে প্রকাশ পায়। কারণ ভেদে পেট ব্যথার ধরণ ভিন্ন হতে পারে।

পেট ব্যথার কারণ ও ধরণ

কারণসমূহ	ব্যথার ধরণ
ডায়রিয়া ও খাদ্যে বিষক্রিয়া	পুরো পেট জুড়ে ব্যথা হতে পারে
অ্যাপেন্ডিসাইটিস (Appendicitis)	নাভির মাঝখান থেকে প্রথমে ব্যথা শুরু হয়, পরে তলপেটের ডান দিকে ছড়িয়ে যেতে পারে এবং সেখানে হাত দিলেই ব্যথা হতে পারে
পেপটিক আলসার	পেপটিক আলসারের ব্যথা সাধারণত পেটের ওপরদিকে মাঝখানে শুরু হয়, পেটে জ্বালাপোড়া হতে পারে
অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ (Pancreatitis)	অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহের কারণে পেট ব্যথা খুবই তীব্রতর হয় যা পেটের পিছন দিকে অনুভূত হতে পারে। এক্ষেত্রে পেট ফাঁপা ও পেট শক্ত হয়ে যেতে পারে
কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation)	পেটের বাম ও ডান দিকে ব্যথা করে। পায়খানা হলে এই ব্যথা কমে যেতে পারে
যকৃতের প্রদাহ (Hepatitis) ও পিত্তথলির প্রদাহ (Cholecystitis)	পেটের ডান দিকে ব্যথা হতে পারে, ব্যথা পেটের পেছন পর্যন্ত ছড়াতে পারে, বমি হতে পারে
কৃমিজনিত সমস্যা	পেট ব্যথা হয়, বমি বমি ভাব হতে পারে, বদহজম হতে পারে
কিডনি, মূত্রথলি ও মূত্রনালীতে পাথর এবং মূত্রতন্ত্র সংক্রান্ত সমস্যা (Urinary Tract Infection)	ডান অথবা বাম কিডনিতে পাথর হলে সেই পাশে ও পেছনে ব্যথা হতে পারে। মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ হলে তলপেটে ব্যথা হতে পারে
মহিলাদের ঋতুস্রাবকালীন ব্যথা	ঋতুস্রাব চলাকালীন সময় তলপেট, কোমর, উরু ও পিঠ এসব স্থানে ব্যথা অনুভূত হতে পারে
মেয়েদের ডিম্বাশয়ে সংক্রমণ বা সিস্ট (Ovarian Cyst)	এই ক্ষেত্রে তলপেটে ব্যথা হতে পারে
ইনটেসটিনাল অবস্ট্রাকশন (Intestinal Obstruction)	অন্ত্রের গতিপথ বন্ধ হয়ে পেটে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব হতে পারে। তলপেটে মোচড়ানো ব্যথা হতে পারে এবং পেট ফুলে যেতে পারে
অন্ত্রে ছিদ্র হয়ে যাওয়ায় ব্যথা (Intestinal Perforation)	প্রচণ্ড পেট ব্যথা হতে পারে, বমি হতে পারে, পেট ফুলে যেতে পারে

শরীরের অন্যান্য রোগের কারণে পেট ব্যথা

শরীরের অন্য অঙ্গের কোনো রোগের কারণে পেট ব্যথা হতে পারে। যেমন-

- মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (Myocardial Infarction)
- নিউমোনিয়া (Pneumonia)
- মেরুদন্ডের হাড়ের স্থানচ্যুতি (Intervertebral Disc Prolapse)
- স্পাইনাল কর্ডে টিউমার (Spinal Cord Tumour)
- বিপাকজনিত রোগ যেমন- কিডনি ফেইলিয়র, ডায়াবেটিস
- হারপিস জোস্টার ভাইরাসের সংক্রমণ (Herpes Zoster)

চিকিৎসা

স্থানভেদে পেট ব্যথার কারণসমূহ

চিকিৎসা

পেট ব্যথার চিকিৎসার জন্য কিছু ওষুধের প্রয়োজন হয়। নিচে কিছু ওষুধের নাম দেওয়া হলো-

- অ্যান্টি আলসারেন্ট (Anti-Ulcerant) যেমন- ওমিপ্রাজল (Omeprazole), র‍্যাবিপ্রাজল (Rabeprazole), ইসোমিপ্রাজল (Esomeprazole) ইত্যাদি
- অ্যান্টি স্পাজমটিক যেমন- টাইমোনিয়াম মিথাইল সালফেট (Timonium Methyl Sulphate)
- কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময়ের জন্য ল্যাক্টুলোজ (Lactulose), ইসবগুল
- কৃমি নিরাময়ের ওষুধ যেমন- অ্যালবেনডাজল (Albendazole), মেবেনডাজল (Mebendazole) ইত্যাদি
- প্রদাহ নিরাময়ের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক

পরীক্ষা

পেট ব্যথার চিকিৎসা করার আগে কিছু পরীক্ষা করা প্রয়োজন হয়-

- আল্ট্রাসনোগ্রাফী (Ultrasonography)
- রক্ত পরীক্ষা (Blood Test)
- প্রস্রাব ও পায়খানা পরীক্ষা (Urine and Stool Test)
- বেরিয়াম এনেমা এক্স-রে (Barium Enema X-ray)
- এন্ডোস্কোপী (Endoscopy)
- কোলনোস্কোপী অথবা সিগময়েডোস্কোপী (Colonoscopy or Sigmoidoscopy)
- সিটি স্ক্যান (CT scan)
- এক্স-রে (X-ray)
- ইলেক্ট্রো-কার্ডিয়োগ্রাম

- ব্যথানাশক ওষুধ - ব্যথানাশক ওষুধগুলো হলো- প্যারাসিটামল (Paracetamol), ডাইক্লোফেনাক (Diclofenac), আইবুপ্রফেন (Ibuprofen) ইত্যাদি। তিনভাবে ব্যথানাশক ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। যেমন- মুখে, পায়ুপথে ও শিরাপথে।

কিছু কিছু পেট ব্যথাতে অস্ত্রোপচার করা লাগতে পারে। যেসব পেট ব্যথায় অস্ত্রোপচার করতে হয় তা হলো-

- অ্যাপেন্ডিসাইটিস
- পিত্তথলির প্রদাহ
- কিডনি, মূত্রথলি ও মূত্রনালীতে পাথর অথবা প্রদাহ
- ইনটেসটিনাল অবস্ট্রাকশন
- পারফোরেশন বা অন্ত্রে ছিদ্র হয়ে যাওয়ায় ব্যথা ইত্যাদি

উপসংহার

পেট ব্যথার ধরণ দেখে অনেক সময় রোগ নির্ণয় করা যায়। পেট ব্যথার সঠিক স্থান, ধরণ, আনুষঙ্গিক উপসর্গ ইত্যাদি মিলিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি ব্যথার কারণ খুব সাধারণও হয় তবুও অবহেলা করা উচিত নয়।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

ছবি দেখে রোগ নির্ণয়

টনসিলাইটিস

টনসিলাইটিস

জিহ্বার শেষপ্রান্তে, আলজিহ্বার নীচে বাম ও ডানপাশে লসিকা কলা বা লিম্ফয়েড টিস্যু দিয়ে তৈরি অঙ্গ হলো টনসিল। টনসিল যদি ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রদাহ বা ইনফেকশনের সৃষ্টি করে তাকে টনসিলাইটিস বলে। এই রোগে টনসিল বড় হয়ে যায় ও গলায় অনেক ব্যথা হয়।

কর্নিয়াল আলসার

কর্নিয়ার এপিথেলিয়াম কোনোভাবে বাইরের কোনো জিনিস দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হলে সেখানে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা ছত্রাক দ্বারা সংক্রমণ হয়। এর ফলে কর্নিয়াল এপিথেলিয়াম নষ্ট হয়ে কর্নিয়াল আলসার হয়। কর্নিয়াল আলসার হলে চোখে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে যেমন- চোখ খুলতে সমস্যা হয়, আলোর দিকে তাকাতে কষ্ট হয়, চোখ ছোট হয়ে আসে, চোখের চারদিকে লাল হয়ে যায়, অনেক সময় ব্যথা হয়।

কর্নিয়াল আলসার

ভাইরাল ওয়ার্টস

ভাইরাল ওয়ার্টস

হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস দ্বারা শরীরে সংক্রমিত হলে ত্বকের কোনো অংশ যদি শক্ত, মোটা, খসখসে দানার মত বৃদ্ধি পায় তখন তাকে ভাইরাল ওয়ার্টস বলে। আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসলে এই ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট ওয়ার্টস অন্যের শরীরে সংক্রমিত হতে পারে। আক্রান্ত স্থান চুলকালে বা ঘষলে এটি ত্বকের অন্যান্য স্থানেও ছড়াতে পারে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভাইরাল ওয়ার্টসের চিকিৎসা করলে এটি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যায়।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ম্যালেরিয়া - একটি মশাবাহী পরজীবীজনিত রোগ

ম্যালেরিয়া খুবই পরিচিত একটি সংক্রামক রোগ যা প্লাজমোডিয়াম (Plasmodium) বর্গের এককোষীয় পরজীবী দ্বারা সংক্রামিত হয়। প্লাজমোডিয়াম পরজীবী এনোফিলিস (Anopheles) মশার মাধ্যমে ম্যালেরিয়া ছড়ায়। ম্যালেরিয়া রোগটি বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তবর্তী পাহাড়ী এলাকা ও তৎসংলগ্ন সমতল এলাকায় বসবাসকারী লোকজনকে বেশী আক্রান্ত করে। পরজীবী সংক্রমণ জনিত জ্বরগুলোর মধ্যে ম্যালেরিয়া অন্যতম যাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী।

ম্যালেরিয়ার জীবাণু

প্লাজমোডিয়ামের ৪টি প্রজাতি মানবদেহে ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে। সেগুলো হলো-

- প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম *(Plasmodium falciparum)*
- প্লাজমোডিয়াম ভাইভেক্স *(Plasmodium vivax)*
- প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি *(Plasmodium malariae)*
- প্লাজমোডিয়াম ওভালি *(Plasmodium ovale)*

ম্যালেরিয়া রোগের জীবনচক্র

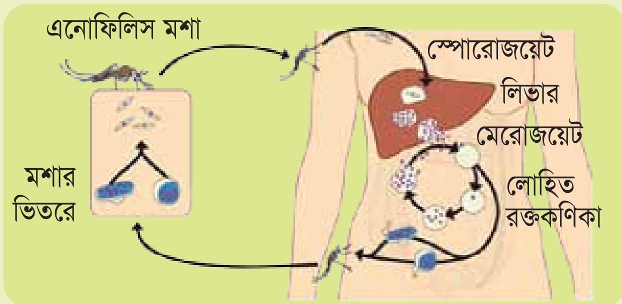

মশার কামড়ের মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার জীবাণু রক্তে প্রবেশ করে

↓

রক্ত দ্বারা বাহিত হয়ে তা লিভার বা যকৃতে প্রবেশ করে

↓

লিভারে জীবাণু সংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিপক্কতা পায়

↓

এরপর পরিপক্ক জীবাণু লিভার থেকে বের হয় ও রক্তের লোহিত কণিকাগুলোকে আক্রমণ করে

↓

সবশেষে আক্রান্ত রক্তকণিকা ভেঙ্গে যায় এবং ম্যালেরিয়ার জীবাণু রক্তে ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে ম্যালেরিয়া হয়

যাদের ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী

যেকোনো বয়সের মানুষের ম্যালেরিয়া হতে পারে। যাদের ম্যালেরিয়ার ঝুঁকি বেশী তারা হলো-

- যারা ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় বসবাস করে
- ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় ভ্রমণ করলে
- শিশু ও অল্প বয়স্করা বেশী আক্রান্ত হতে পারে
- গর্ভবতী মায়ের ম্যালেরিয়া হলে গর্ভস্থ শিশুরা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে

লক্ষণ

ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রধান লক্ষণ হলো ৪৮ ঘন্টা পর পর জ্বর আসা। মশা কামড়ের ৮ থেকে ১২ দিন পর জ্বর শুরু হয়। এই জ্বর কে তিনটি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। ধাপগুলো হলো-

ঠাণ্ডা ধাপ (Cold stage) - প্রথম দিকে জ্বর ১৫ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা পর্যন্ত থাকে। এই সময় পর্যন্ত জ্বর থাকাকালীন সময়কে ঠাণ্ডা ধাপ (Cold stage) বলে। এই সময়ে রোগীর তাপমাত্রা ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত বাড়তে পারে। এর সাথে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

গরম ধাপ (Hot stage) - এই ধাপে জ্বর ১ ঘন্টা থেকে ৪ ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এরপর রোগী গরম অনুভব করে। তার সাথে তৃষ্ণা বেড়ে যায়, শ্বাস প্রশ্বাস বেড়ে যায় এবং হাত ও পা গরম ও শুষ্ক হয়ে যায়।

ঘাম ধাপ (Sweating stage) - এই ধাপে জ্বর ২ ঘন্টা থেকে ৩ ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তারপর রোগীর তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং রোগী সুস্থ অনুভব করতে শুরু করে।

জ্বর ছাড়া কিছু অন্যান্য লক্ষণ দেখা দিতে পারে-

- মুখের ভিতর চারদিকে ঘা হয়
- খাবারের অরুচি হয়
- দুর্বলতা বোধ ও ক্লান্তি বোধ হয়
- প্লীহা বড় হয়ে যায় (Splenomegaly)
- যকৃত বা লিভার বড় হয়ে যায় (Hepatomegaly)
- রক্তশূণ্যতা হয় (Anemia)
- জন্ডিস হয় (Jaundice)
- মাংসপেশীতে ব্যথা অনুভূত হয়

পরীক্ষা

ম্যালেরিয়া হলে নিচের পরীক্ষাগুলো করতে হবে-

- কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট (Complete Blood Count)
- রক্তের ফ্লিম (Blood Flim) পরীক্ষাঃ এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্লাজমোডিয়ামের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়। সাধারণত দুই ধরণের পেরিফেরাল ব্লাড ফ্লিম (Peripheral Blood Flim) তৈরি করা হয় যেমন-

  থিক ফ্লিম (Thick Flim)ঃ পরজীবী শনাক্ত করার জন্য

  থিন ফ্লিম (Thin Flim)ঃ পরজীবীর জাতি (Species) শনাক্ত করার জন্য
- ইম্যুনোফ্লুরোসেন্স টেস্ট (Immunofluroscence Test)
- ইন্ডিরেক্ট হিমাগ্লুটিনেশন টেস্ট (Indirect Haemoglutination Test)
- পি সি আর (PCR)
- এলাইজা (ELISA)

পরজীবী শনাক্তকরণ

পরজীবীর জাতি (Species) শনাক্তকরণ

চিকিৎসা

- সাধারণ বা Mild *Plasmodium falciparum* ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রেঃ

  Co-artemether; যাতে আছে Tab. Artemether এবং Tab. Lumefantrine অথবা Tab. Quinine + Tab. Doxycycline/ Tab. Clindamycin/ Tab. Atovaquone + Tab. Proguanil

  রোগী যদি গর্ভবতী হয় তাহলে রোগীকে Tab. Doxycycline ও Tab. Artemether দেওয়া যাবে না।

- জটিল বা Complicated *Plasmodium falciparum* ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রেঃ

  Inj. Artesunate অথবা Quinine salt

  উপরের চিকিৎসার সাথে সাথে ম্যালেরিয়াজনিত জটিলতারও চিকিৎসা করতে হবে।

- *Plasmodium falciparum* ব্যতীত অন্য ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রেঃ

  Tab. Chloroquine অথবা Tab. Primaquine

ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় গেলে নিচের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল ট্যাবলেট	সেবনের নিয়ম
Chloroquine প্রতিবন্ধক হলে Tab. Mefloquine*	ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় যাওয়ার ২ থেকে ৩ সপ্তাহ আগে থেকে Tab. Mefloquine শুরু করতে হবে এবং এলাকা থেকে আসার ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত সেবন করতে হবে
অথবা Tab. Doxycycline[φ]	ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় যাওয়ার ১ সপ্তাহ আগে থেকে Tab. Doxycycline শুরু করতে হবে এবং এলাকা থেকে আসার ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত সেবন করতে হবে
অথবা Tab. Atovaquone এবং Tab. Proguanil [δ]	ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় যাওয়ার ১ থেকে ২ দিন আগে থেকে Tab. Atovaquone এবং Tab. Proguanil শুরু করতে হবে এবং এলাকা থেকে আসার ১ সপ্তাহ পর্যন্ত সেবন করতে হবে
Chloroquine প্রতিবন্ধক না হলে Tab. Chloroquine এবং Tab. Proguanil	ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় যাওয়ার ১ সপ্তাহ আগে থেকে Tab. Chloroquine এবং Tab. Proguanil শুরু করতে হবে এবং এলাকা থেকে আসার ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত সেবন করতে হবে

* Tab. Mefloquine *গর্ভকালীন প্রথম তিন মাসে, স্তন্যদানকারী মায়েদের, মৃগী রোগীদের এবং হৃদরোগীদের দেওয়া যাবে না*

φ Tab. Doxycycline *গর্ভাবস্থায় দেওয়া যাবে না এবং আলোর প্রতি সংবেদনশীল রোগীদেরও দেওয়া যাবে না*

δ Tab. Atovaquone *এবং* Tab. Proguanil *গর্ভাবস্থায় দেওয়া যাবে না*

ম্যালেরিয়াজনিত জটিলতা	
জীবাণু	**জটিলতা**
Plasmodium falciparum **ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে**	• মস্তিষ্কের ম্যালেরিয়া (Cerebral Malaria) • মারাত্বক রক্তশূণ্যতা (Severe Anemia) • ঘাড় শক্ত হয়ে যেতে পারে • রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যেতে পারে • ফুসফুসে পানি জমতে পারে (Pulmonary Edema) • কিডনি ফেইলর (Kidney Failure) • রক্তনালীর ভিতরে রক্ত জমাট বেঁধে "ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার" হতে পারে । এই রোগে রোগীর প্রস্রাবের সাথে রক্ত যায় এবং এর ফলে প্রস্রাবের রঙ কালচে হয় • রক্তে জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ (Septicemia) • শক (Shock) হতে পারে • রক্তে ইউরিয়ার পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে • প্লীহা (Spleen) বড় হয়ে যেতে পারে এবং ছিঁড়ে যেতে পারে (Splenic Rupture) • ডায়রিয়া হতে পারে • গর্ভবতী মায়ের ক্ষেত্রে গর্ভপাত, কম ওজনের শিশু জন্মদান, মৃত শিশু জন্মদান এবং মায়েরও মৃত্যু হতে পারে
Plasmodium falciparum **ব্যতীত অন্য ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে**	• পুনরায় ম্যালেরিয়া হতে পারে • নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম (Nephrotic Syndrome) হতে পারে • রক্তশূণ্যতা (Anemia) হতে পারে • হার্ট ফেইলর (Heart Failure) হতে পারে

তথ্যসুত্রঃ ১. *Davidson's Principal and Practice of Medicine; 22nd Edition*
২. ইন্টারনেট

কৃমিজনিত রোগ

কৃমি হচ্ছে মানুষের দেহের সবচেয়ে ক্ষতিকর ও বৃহৎ পরজীবী। এটি দেহের অন্ত্রের অভ্যন্তরে বাস করে, শরীর থেকে খাবার গ্রহণ করে বেঁচে থাকে ও বংশ বৃদ্ধি করে। কৃমি আমাদের দেশে একটি সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা। যেকোনো বয়সের মানুষের কৃমি হতে পারে তবে শিশুদের কৃমির সংক্রমণ বেশি দেখা যায়।

গোল কৃমি

যেসব কৃমি মানুষের অন্ত্রে পরজীবী হিসেবে বাস করে সেগুলোর মধ্যে প্রধান হলো গোল কৃমি (Round Worm), বক্র কৃমি (Hook Worm), সুতা কৃমি (Thread Worm), ফিতা কৃমি (Tape Worm) ইত্যাদি। নিচে গোত্র অনুযায়ী কৃমির প্রকারভেদ দেওয়া হল-

- অ্যানিলিডা (Annelida)ঃ এরা সাধারণত গোলাকৃতি হয় যেমন- গোল কৃমি
- নেমাটোডা (Nematoda)ঃ এরা সাধারণত বৃত্তাকার হয় যেমন- বক্র কৃমি ও সুতা কৃমি
- প্লাটিহেলমিনথেস (Platyhelminthes)ঃ এরা পাতার মত সমতল হয় যেমন- ফিতা কৃমি

সংক্রমণ

গ্রামে বসবাসরত বেশিরভাগ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। তাই গ্রামের বেশীর ভাগ মানুষ উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ করতে অভ্যস্ত। যেখানে সেখানে মলত্যাগের ফলে কৃমির ডিম মলের মাধ্যমে মাটি ও পানিতে ছড়িয়ে পরে। নোংরা পরিবেশ ও স্যাঁতস্যাঁতে মাটি হচ্ছে কৃমির আবাসস্থল।

- এসব স্থানে খালি পায়ে চলাফেরা করলে কৃমি পায়ের তালু ভেদ করে শরীরে ঢুকে পড়ে
- এসব স্থানে মাটি ও ময়লা হাত দিয়ে স্পর্শ করলে অসাবধানতা ও অপরিচ্ছন্নতার জন্য কৃমি নখের মাধ্যমে শরীরে ঢুকে পড়তে পারে
- এসব মাটিতে উৎপন্ন শাকসবজি, ফলমূল কাঁচা খেলে কৃমির সংক্রমণ হতে পারে
- কৃমি দ্বারা কলুষিত পানি পান করলেও কৃমি শরীরে ঢুকে পড়তে পারে

বিভিন্ন কৃমির বর্ণনা ও লক্ষণ

সাধারণত মানুষের অন্ত্রে যেসব কৃমি বাস করে তাদের বর্ণনা ও লক্ষণ নিচে দেওয়া হলো-

গোল কৃমি (Round Worm)

বাংলাদেশের মানুষের বিশেষ করে শিশুদের অপুষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ হল গোল কৃমির সংক্রমণ। এরা দেখতে কেঁচোর মত এবং পরিণত অবস্থায় ৬ থেকে ১৪ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। সাধারণত অপরিষ্কার শাকসবজি, ফলমূল, নোংরা খাবার, কৃমি দ্বারা কলুষিত পানি ইত্যাদির মাধ্যমে গোল কৃমির ডিম মানুষের দেহে প্রবেশ করে।

লক্ষণ

- বদহজম, ক্ষুধামন্দা বা খাবারে অরুচি হতে পারে
- বমি বমি ভাব হতে পারে
- ওজন কমে যেতে পারে
- পাতলা পায়খানা হতে পারে
- শুকনা কাশি ও শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ হতে পারে
- যকৃতের প্রদাহ ও জন্ডিস হতে পারে
- অ্যাপেন্ডিসাইটিস হতে পারে

সুতা কৃমি (Thread Worm)

এই কৃমি দেখতে সুতার মত, চিকন, ছোট, পাতলা এবং সাদা রঙের হয়। সুতা কৃমি ২ থেকে ১২ মিলিমিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের হতে পারে। যখন এই কৃমি মলদ্বারের চারপাশে ডিম পাড়ে তখন মলদ্বারে চুলকানি অনুভূত হয়। সেই সময় কেউ যদি চুলকানি নিবারণের জন্য আঙ্গুল দিয়ে মলদ্বারে চুলকানি নিবারণের চেষ্টা করে, তখন এই কৃমির ডিম

নখে ঢুকে যায়। তারপর ঐ ব্যক্তি যদি তার হাত দিয়ে দরজার হাতল, পানির কল বা অন্য কিছু স্পর্শ করে তখন ঐ সকল বস্তুতে কৃমির ডিম লেগে যায়। তারপর অন্যকোনো ব্যক্তি ঐ সব বস্তু হাত দিয়ে স্পর্শ করলে এবং হাত না ধুয়ে খাবার খেলে সুতা কৃমি খাবারের মাধ্যমে তার দেহে প্রবেশ করে।

লক্ষণ

- মলদ্বারে প্রচন্ড চুলকানি দেখা দিতে পারে
- দীর্ঘদিন পায়ুপথের সংক্রমণের কারণে পাইলস হওয়ার সম্ভবনা থাকতে পারে

বক্র কৃমি (Hook Worm)

এ জাতীয় কৃমির মুখে হুক বা বড়শির মতো দাঁত থাকে। এরা ২ থেকে ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। এই কৃমি সবুজাভ সাদা রঙের হয়ে থাকে। যেখানে সেখানে মলত্যাগ করলে বক্র কৃমির ডিম মলের সঙ্গে বেরিয়ে আসে, পরে আর্দ্র ও ভেজা মাটিতে লার্ভায় পরিণত হয় এবং সংক্রমণ করার জন্য উপযুক্ত হয়। মাটিতে বা ঘাসে লেগে থাকা বক্র কৃমি (লার্ভা) সাধারণত পায়ের তলার চামড়া দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে।

লক্ষণ

- রক্তশূণ্যতা দেখা দিতে পারে
- রক্তক্ষয় জনিত দুর্বলতা দেখা দিতে পারে
- চোখ ও মুখ ফ্যাকাসে হতে পারে
- হাত ও পা ফুলতে পারে
- শ্বাসকষ্ট হতে পারে
- পেটে অস্বস্তি ও ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে
- বুক ও পেটে ব্যথা হতে পারে
- কাশির সাথে রক্ত যেতে পারে

ফিতা কৃমি (Tape Worm)

এই কৃমি দেখতে ফিতার মতো। এটি ৫ থেকে ৩৩ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। অসংখ্য ছোট ছোট চ্যাপ্টা খণ্ড একটির সঙ্গে আরেকটি যুক্ত হয়ে এ কৃমির দেহ গঠন করে। যেখানে সেখানে মলত্যাগের ফলে এই কৃমি মাটি ও পানিতে ছড়িয়ে পড়ে। মাটিতে থাকা ঘাস বা কোনো উদ্ভিদ অথবা কৃমি দ্বারা কলুষিত পানি গরু বা মহিষ খেলে, এদের ডিমগুলো গরু ও মহিষের দেহে লার্ভা হিসেবে প্রবেশ করে এবং সিস্ট হয়ে মাংস পেশিতে বেঁচে থাকে। তাই কম সিদ্ধ বা অর্ধ সিদ্ধ মাংস খেলে ফিতা কৃমি মানুষের দেহে সরাসরি প্রবেশ করে।

লক্ষণ

- বমি বমি ভাব ও ডায়রিয়া হতে পারে
- পেটে ব্যথা ও ক্ষুধামন্দা হতে পারে
- রক্তের মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে পারে ফলে মাথাব্যথা ও খিঁচুনি হতে পারে

চিকিৎসা

কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হলে অ্যালবেনডাজল, মেবেনডাজল, লিভামিজল, পাইপেরাজিন গ্রুপ এর ওষুধ দেওয়া হয়। যদি সুতা কৃমি দ্বারা পায়ুপথে ঘা হয় তখন জিঙ্ক অথবা অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম ব্যবহার করা হয়। বক্র কৃমির দ্বারা সৃষ্ট রক্তশূণ্যতার জন্য আয়রন ট্যাবলেট দেওয়া হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। পুষ্টির অভাবজনিত রোগ হলে পুষ্টিকর খাবার খেতে হয়।

প্রতিরোধ

কৃমিজনিত সমস্যার প্রতিরোধ সমূহ নিচে দেওয়া হল-

- কাঁচা শাকসবজি ভালোমতো ফুটানো পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে ও ভাল করে রান্না করে খেতে হবে
- খাওয়ার আগে ও মলত্যাগের পরে সাবান বা ছাই দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে
- হাতের নখ ছোট ও পরিষ্কার রাখতে হবে
- মল নিষ্কাশনের সুষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
- জন্মের পর প্রথম ৫ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে শুধু মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে
- ফুটানো পানি পান করতে ও ব্যবহার করতে হবে
- মাঠে, রাস্তায় ও শৌচাগারে খালি পায়ে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে
- নির্দিষ্ট সময় পরপর পরিবারের সকলকে বয়স অনুযায়ী নির্দিষ্ট মাত্রার কৃমির ওষুধ সেবন করতে হবে

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

গর্ভকালীন উপকারী ৯টি খাদ্য

ডিম

ডিম শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জন্মগত ত্রুটি দূর করতে সাহায্য করে। গর্ভাবস্থায় সিদ্ধ ডিম খাওয়া উপকারী। তবে অবশ্যই তা ভালো মতো সিদ্ধ করে খেতে হবে।

মিষ্টি আলু

মিষ্টি আলুতে প্রচুর পরিমানে ফাইবার, ভিটামিন বি-৬, পটাশিয়াম, ভিটামিন সি এবং আয়রন থাকে যা শিশুর বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়। এছাড়া এতে রয়েছে কপার যা শরীরে আয়রন দ্রুত শোষন করতে সাহায্য করে।

বাদাম

বাদামে প্রচুর ওমেগা-৩, ফ্যাটি এসিড, প্রোটিন, ফাইবার এবং বিভিন্ন ধরণের ভিটামিন ও মিনারেল থাকে। এছাড়াও বাদামে ম্যাগনেশিয়াম থাকে যা সময়ের আগে সন্তান প্রসবের ঝুঁকি কমায় ও শিশুর স্নায়ুতন্ত্রের গঠনে সাহায্য করে ।

শস্য ও ডাল

শস্য ও ডালে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও আয়রন থাকে। এছাড়া জিংক ও ক্যালসিয়াম থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্যে অনেক উপকারী।

মাংস

মাংস থেকে প্রোটিন ও আয়রন পাওয়া যায়। যা শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

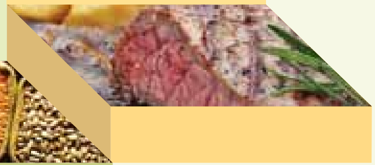

কমলার রস

কমলার রসে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম, ভিটামিন সি পাওয়া যায়। এটি শিশুর দাঁত ও হাড়ের গঠনকে মজবুত করে।

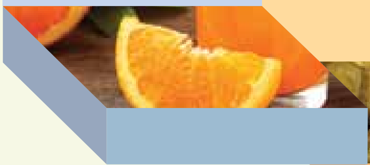

মাছ

মাছ প্রচুর পরিমাণের প্রোটিনের উৎস। মাছের তেলে ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড থাকে। যা গর্ভবতী মায়ের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

দই

দই-এ ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বি এবং জিংক রয়েছে যা একজন গর্ভবতী মায়ের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

সবুজ শাকসবজি

শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যা বাচ্চা ও মা দুই জনকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

ইনফো কুইজের সকল প্রশ্নগুলো বিশেষ প্রবন্ধ **'ম্যালেরিয়া - একটি মশাবাহী পরজীবীজনিত রোগ'** থেকে নেয়া হয়েছে। আশা করি আপনারা বিশেষ প্রবন্ধটি ভালোভাবে পড়ে সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে ইনফো স্বাস্থ্য সাময়িকীর সাথে সংযুক্ত বিজনেস রিপ্লাই পোষ্ট কার্ডটি আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ ইং তারিখের মধ্যে আপনার নিকটস্থ আমাদের প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করবেন।

১ ম্যালেরিয়ার পরজীবীর নাম কি?

ক ☐ উচেরেরিয়া
খ ☐ প্লাজমোডিয়াম
গ ☐ জিয়ার্ডিয়া
ঘ ☐ পোলিও

২ কোন মশার মাধ্যমে ম্যালেরিয়া ছড়ায়?

ক ☐ কিউলেক্স
খ ☐ এডিস
গ ☐ ম্যানসোনিয়া
ঘ ☐ এনোফিলিস

৩ ম্যালেরিয়ায় কত দিন পর পর জ্বর আসে?

ক ☐ ৪০ ঘন্টা
খ ☐ ২৪ ঘন্টা
গ ☐ ৪৮ ঘন্টা
ঘ ☐ ৩৬ ঘন্টা

৪ ম্যালেরিয়ার প্রজাতি কয়টি?

ক ☐ ২টি
খ ☐ ৩টি
গ ☐ ৪টি
ঘ ☐ ৫টি

৫ নিচের কোন পরীক্ষার মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার পরজীবী শনাক্ত করা হয়?

ক ☐ রক্তের ফ্লিম পরীক্ষা
খ ☐ কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট
গ ☐ প্রস্রাব পরীক্ষা
ঘ ☐ পি সি আর

৬ Primaquine কোন ম্যালেরিয়াতে দেওয়া হয়?

ক ☐ সাধারণ *P. falciparum* ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে
খ ☐ জটিল *P. falciparum* ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে
গ ☐ জটিলতাহীন ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে
ঘ ☐ *P. falciparum* ব্যতীত অন্য ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে

৭ ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় গেলে নিচের কোন ওষুধ টি দেওয়া হয় না?

ক ☐ Isoniazid
খ ☐ Choloroquine
গ ☐ Doxycycline
ঘ ☐ Malarone

৮ ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে নিচের কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে?

ক ☐ বেশী করে গাছ লাগাতে হবে
খ ☐ বাড়ির পাশের ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কার রাখতে হবে
গ ☐ মশারী ব্যবহার পরিহার করতে হবে
ঘ ☐ খাবার আগে হাত ধুতে হবে

৯ নিচের কোনটি ম্যালেরিয়ার জটিলতা?

ক ☐ মস্তিস্কের ম্যালেরিয়া
খ ☐ মারাত্বক রক্তশূন্যতা
গ ☐ ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার
ঘ ☐ উপরের সবগুলো

১০ কাদের ম্যালেরিয়ার ঝুঁকি বেশী?

ক ☐ ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় বাস করলে
খ ☐ ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় ভ্রমণ করলে
গ ☐ ম্যালেরিয়া আক্রান্ত গর্ভবতী মায়েরা
ঘ ☐ উপরের সবগুলো

চমকপ্রদ তথ্য

রক্ত পরীক্ষায় জানা যাবে আত্মহত্যার প্রবণতা

বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ মানুষ আত্মহত্যা করে। হতাশা, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে মানুষ এই ভুল পদক্ষেপ নেয় যা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অনেক দুঃখ দুর্দশা নিয়ে আসে। একজন মানুষের আত্মহত্যার ঝুঁকি রয়েছে কিনা, সেটি যদি আগে থেকে শনাক্ত করা যায় তাহলে সময়মতো সঠিক পরামর্শ দিয়ে আত্মহত্যার প্রবণতা কিছুটা হলেও রোধ করা সম্ভব হবে। সম্প্রতি গবেষকরা শনাক্ত করেছেন যে, মানুষকে আত্মহত্যা প্রবণ করে তোলার জন্য দায়ী এক ধরণের প্রোটিন। ছোট্ট একটি রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যাবে কারো মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা রয়েছে কি না। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের গবেষকরা মানুষের রক্তে আত্মহত্যা প্রবণতা সৃষ্টিকারী কয়েক ধরণের রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (RNA) শনাক্ত করেছেন। তারা জানিয়েছেন, আত্মহত্যার চেষ্টা করা বা আত্মহত্যা করেছে এমন মানুষের রক্তে অতি উচ্চমাত্রায় এই RNA বায়োমার্কার বিদ্যমান থাকে। তারা কিছু আত্মহননকারী ব্যক্তির মরদেহ থেকে সংগৃহীত রক্ত পরীক্ষা করে তাতে বিভিন্ন জিনের তুলনামূলক পার্থক্য নির্ণয় করেন। এতে চারটি জিনের উপস্থিতি বেশি বলে তারা শনাক্ত করেন। এসব জিনের সংকেত নির্ধারক কয়েকটি প্রোটিন মানুষের মানসিক চাপ এবং কোষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। গবেষকেরা আত্মহত্যা প্রবণ জীবিত ব্যক্তির রক্তেও এ ধরণের প্রোটিনের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করেন। তাই তারা বলছেন, এখন এই প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে সহজেই বলে দেয়া যাবে কারো আত্মহত্যার প্রবণতা রয়েছে কিনা।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

প্রকাশনায়
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট, এসিআই লিমিটেড
৮৯ গুলশান এভিনিউ, সিম্পলট্রি আনারকলি, ঢাকা-১২১২